অমীমাংসার আলো-আঁধারি

মিহির চক্রবর্তী

একটি খেলায় জড়াতে চলেছি উৎপলকুমার বসুর সঙ্গে। প্রায় চোর-পুলিশ খেলা, ছেলেবেলাকার। খানিকটা দূরত্ব রেখেছি আমাদের মধ্যে। চারদিকে ছড়ানো — সেলাই মেশিন— আকাশযান— বিষণ্ণ সন্ধ্যা— টেলিগ্রাম— বিজলীবালা— ধূসর আতাগাছ— স্মৃতি— দাঙ্গা— শোভাযাত্রা—চায়ের নিমন্ত্রণ— রক্ষাকবচ— উড়ন্ত ষাঁড়— রৌদ্রকেলাস— সহ্যভালুক— রাক্ষস— আঁধারমথ— প্রতিহিংসাপরায়ণ পর্দা আরো কতই না খলসামগ্রী। এর মধ্যে একটু পরেই লুকিয়ে পড়বেন উৎপল। আমার দায় তাঁকে খুঁজে বার করার। প্রায় অসাধ্য, আমি জানি। আরো অসাধ্য, কারণ এইসব খলসামগ্রী জীবন্ত। তারাও মাংসভুক্ উদ্ভিদের মতো লুকিয়ে ফেলতে চাইবে উৎপলকে তাদের পাতার, বৃন্তের এবং ডালপালার গভীরে— তাদের শরীরে। তবু দেখাই যাক না। রণনিমত্ত হৃদয় আমার উদ্বেলিত। খলসামগ্রীর সুরূপে কুরূপে যতই মায়াজাল বিস্তার করুন না পিশাচসিদ্ধ উৎপল, হাতে থাকে যদি এই লেখনী আর বাতাবরণে সম্পাদকের প্রশ্রয় তাহলে সহজে নিস্তার নেই তাঁর। আমরা দুজনে, কেউই, হত্যাপ্রিয় নই, তবু

দর্শকবৃন্দ, হতাশ হবেন না—এই পূর্বাহ্নেই এ খেলা হিংস্র হয়ে ওঠার পূর্বলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। কী করি, কবি ও কবিতা-পাঠক হলেও মানুষের শরীর তো আমাদের। এই দুই বর্গের মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কে কোথাও কি হিংস্রতা আছে? ভেবে দেখবেন কেউ কখনো। আপাতত জিরো-আওয়ার। কেউ বাঁশি বাজিয়ে দিল বোধহয়। ঐ তিনি লুকিয়ে পড়লেন।

নদীর কাছে গিয়েছিলেম। নদীমাতৃক বাঙালি, খোঁজার শুরু তাই এখানেই। কিন্তু উৎপল, দেখুন দেখুন, কী করছেন সেখানে।

স্তব্ধ নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে আমার মতো দীর্ঘশ্বাসী লোক
কি-ইবা ভাবতে পারে— জলের গভীরতম প্রহেলিকা ছাড়া।'

'ধুয়ে নিই জুতোজোড়াখানি
মুছে নিই এ-পদযুগল
তবু নদী যতটা জটিল
তারো চেয়ে লৌকিকতা গূঢ়।'

লৌকিকতার প্যাচালোপনার কথায় আসা যাবে পরে। আপাতত নদী। নদীকে প্রবাহিনী, স্রোতস্বিনী মনে হয় না তাঁর? শুধু প্রহেলিকা, জলের জটিলতা শুধু? দু-দণ্ড জিরোতে মন চায় না এর পারে বসে? ভাসতে ইচ্ছে করে না এর প্রবাহে? কথা বলতে সাধ হয় না— নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? উৎপলের নদী প্রায় স্থির। তার পার্শ্বগতি আছে— 'জাগো, ঢেউ এসে নাড়া দেয়, বটের শিকড়ে, জলস্পর্শে আছে নদীতীর'। কিন্তু রৈখিক গতি নেই কোনো। আশ্চর্য! আরো দেখুন, উৎপল কখনো (বহুদিন হল) নদীর জলের মধ্যবর্তী নন, তিনি তীরে। 'প্রতিশ্রুতিহীন নদীর খাঁড়ির ভিতরে নেমে দুজন মানুষ তামা ও অভ্র খুঁজছে'। অনেক আগে প্রথম যৌবনে (এও কি স্বাভাবিক!), একটু যেন ইচ্ছে ছিল স্রোতযুক্ত হবার— যখন তাঁর 'বড় মুখ' হবার সাধ ছিল কিছু— 'একটি সুরের জন্ম শত-শতাব্দীর আবহমানতার বুকে দাঁড় ফেলে, নৌকো বেয়ে যাওয়া'— যখন 'কলকাতা অনুপম উড়ন্ত মেঘের পালিতা পাখির মতো' মনে হত— যখন আশা করা যেত 'দিন আরো স্পষ্ট' হবে হয়ত এবং উৎপল ভাবতেন 'যাত্রী হবো দক্ষিণসাগরী'। কিন্তু সেসব দিন শেষ হয়ে গেছে কবে। এখন যদিও তিনি বহমান হন ক্বচিৎ কখনো, সে বহমানতা এইমতো— অসহায়-করুণ।

'নর্মদার জলে আমি অব্যবহৃত ভ্রূণ ভেসে যেতে দেখি।
তোমাকে নদী বাঁকে কাঠি দিয়ে তুলে নেয় বাঙ্গী কিশোর।'

ভাসমান কর্ণকে এভাবেই হয়ত তুলে নিয়েছিলেন সেই আদিম সূত।
অবিশ্বাস্য রকমের নদীবিমুখতা এই বাঙালি কবির।
অথচ সমুদ্র তাঁকে ছাড়েনি কখনো। কারণ হয়ত সমুদ্র বলতেই তো সমুদ্রতীর, যেখানে একটি স্বাভাবিক সীমারেখা আছে, জল ও মাটির। টানাপোড়েন আছে। উৎপল কি

তবে ঢেউয়ের বারেবারে আসা এবং ফিরে যাওয়াতেই স্বস্তিবোধ করেন? 'এই সৈকত, এই ঝাউবন, উড়ে চলা ছায়াপত্ররাশি'। বারবার ব্যবহৃত একে কি তাঁর একঘেয়ে লাগে না?

এখানেও অবশ্যই তীরবর্তী তিনি। সমুদ্রের অনুষঙ্গে তা-ই স্বাভাবিক। মানুষের জীবনালিপিতে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বিরল নয়— এমন কি বাঙালিরও। বাঙালিই তবু ভেলা ভাসাতে ভালবেসে এসেছে গাঙ্গুরের জলে। উৎপলও তীরবর্তী থেকেই সমুদ্রন্নাসিক। 'আমার হোটেল থেকে দেখা গেল— যতখানি তোমাকে দেখায়'। সমস্তটা নয়, পরিপূর্ণতা নয়, অসম্পূর্ণ আধখানা, যতটা সম্ভব পারম্পরিক সীমাবদ্ধ সম্পর্কে। ফলে তীর, ফলে আংশিক।

তবু সমুদ্রের গভীরে এক রুদ্ধতা আছে যা তার ঢেউগুলিকে সীমায় আটকে রাখে। আরামপ্রদ ও নিরাপদ দূরত্বে নিজেকে রেখেও, এই রুদ্ধতার ধ্বনি আসে উৎপলের কাছে এবং তাঁকে ডাকেও।

> 'ফিরে দাও সাগরে আবার। ফিরে দাও উন্মাদ তুফানে
> অস্তিত্বকে ফিরে দাও। বিপুল পৃথিবীময় পাথরের বুকে
> আমি তার ভেঙ্গে-পড়া দেখেছি গর্জনে।'

অথবা, পুরী সিরিজ এবং আবার পুরী সিরিজ, নিসর্গের কবিতামালা না হলেও— এতে সমস্তটা জুড়েই তো সমুদ্রের, সৈকতের সর্বগ্রাসী উপস্থিতি। লাল টালি সাদা বাড়ির প্রেক্ষিতেও 'সাদা ফেনা ও ফেনার টানে ঢেউ পড়ো পড়ো, জাগে বালিয়াড়ি'। যেখানে উৎপলের 'অনেক কথা বলা শেষ হয়, কিছু বাকি থাকে না আর'— সেখানেও 'রাত্রির জোয়ার লেগে নুয়ে পড়ে সৈকততৃণ'। এমনকি ছোটমাসী টুপীবোনা শিখে নিতে যান যেখানে, সেখানে, 'দেবতা বসে ছিঁড়ে ফেলে নীলদিগন্তের নক্ষত্র, সিন্দুর লেখা'।

পুরী সিরিজ দুটিতে থাকা তো স্বাভাবিক, বরং, এই সিরিজের শেষে তিনি বাঁচতেই চাইছেন সমুদ্রের গ্রাস থেকে। 'সমুদ্রতীরকে তুমি বিদায় জানাও। বলো: বিদায় ঝাউবন…'। অথচ আর একটু এগোলেই আদিম পিতা রত্নার বিবাহে আয়োজক আবার সেই সমুদ্র।

> 'হে সমুদ্র অন্ধকারে বিবাহের এত আয়োজন ছিল তোমার প্রান্তরে
> আমরা এনেছি ধাতু, ধর্ম ও সংগীত। রাত্রি
> প্রকম্পিত করে নেমে আসা সৌরবাতাসের লুঠ চলেছে সৈকতে।'

কেন রত্নার বিবাহের জন্য সমুদ্রতীরই এত প্রশস্ত মনে হল? পাহাড়ের উপত্যকা আছে, প্রেইরীর প্রান্তর আছে, পামীরের মালভূমি আছে, মরুভূমির বিস্তার আছে। তবু কেন?

কিন্তু ওঁকে কি এখানেও পাওয়া যাবে? এইসব নদী, সমুদ্র বা অন্য সে সমস্ত

বিকল্পের কথা আমি যা বলতে চেয়েছি এইমাত্র, যাকে বলে 'প্রকৃতি', এখানে কি বৃথাই খুঁজে ফেরা ?

'আরো প্রকৃতির ছবি ১নং'

বেশ ছিল বাতাস, ছিল ঢেউ, ছিল ঝাউশাখা, টার্জানের মতো করে হাঁক দেওয়া মুক্তার শিকারী। হঠাৎ 'প্রতিধর্ম' বলে দেয় : আমি চাই অসম্পূর্ণ পাঠ, সেইমতো মুক্তা বলে।'

একেবারে, রামলাল ডাকাত।

এই দার্শনিকতা খান খান করে দিল না কি অদ্ভুতভাবে গড়ে ওঠা সমস্ত নিসর্গকে ?

'প্রকৃতির ছবি (১৯৬৩)'। দেখুন—

নিরক্ষর বেশ্যাদের একজন, মরিয়মকে চিঠি লিখতে লিখতে তাঁর বাগানের বিবরণ—

'ভোরবেলা জানালার পাশে শুনি রাজহাঁস ডাকছে নালায়, সাদা আমার চাদর দেখে রাজহাঁস খুঁটে দেখছে নিজের পালক, কার্পাসবাগানে ঈশ্বরপ্রদত্ত গাধা চরছে অমনই, আমার দুখানি পা ক্রমশই বিদ্যুৎলতায় জড়িয়ে পড়েছে এবং চকিতে আমি দেখে নিচ্ছি, ঐ অধিদেবতার মল পড়ে আছে বনে'।

এ-ও উৎপলের 'প্রকৃতি'।

একটানা নিসর্গবর্ণনা অথবা বিশুদ্ধ প্রকৃতি অসম্ভব আশা তাঁর কাছে। ধ্বংসের আতাগাছ-এ একটি সুন্দর প্রকৃতি রচনার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ জমে উঠতে না উঠতেই— 'হঠাৎ পিছন থেকে হর্ন বাজাতে বাজাতে, এই নির্জন বনের পথে এগিয়ে আসে একটি টেম্পো'। সাইকো-লজিস্টরা ভেবে দেখবেন এও এক ধরনের স্যাডিজম কিনা। নিসর্গকে গড়তে গড়তেই কেন তিনি এমন আক্রমণ করে বসেন অকস্মাৎ।

অথচ নিশ্চিতভাবে কিছুই কি বলা যায় ? [এমনও তো লিখেছেন উৎপল বসু— 'গির্জার পাশেই নির্জন কবরখানা। সেখানে সিকামোর গাছের সারি। বিশাল ও নিষ্পত্র। উল্লেখযোগ্য ওক ও এল্‌ম। তারাও পত্রহীন। ডীপ উইন্টার। শুকনো ডালের ফাঁকে ফাঁকে বাতাসের আর্তনাদ। খসে পড়ছে বরফ। আজ শুধু প্রকৃতির কথা বলার দিন। আমাদের নয়'।

তাহলে হল না এখানেও। এবারে ও পাড়ায় একটু ঘুরে আসা যাক তবে— মানুষ পাড়ায়। এমন মানবজমিন রইল পতিত। উৎপলের সাবধানবাণী পা বাড়ানো মাত্রই—

'আগেই বলে রাখা ভালো
আমি চাষীদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম এই ভেবে যে
তারা মধ্যবিত্তদের থেকে অধিকতর জটিল ও পরিসংখ্যানজাত।'

এ কি সত্যকথন ? জলের কাছে, চাষীর কাছে শুধু জটিলতার খোঁজে ঘোরাফেরা ?

প্রসঙ্গত একটু সাধারণ কথা। উৎপল কি কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেন, নাকি

আত্মগোপন ? কথা, সভ্যমানুষের কথা, আমরা জানি যতটাই প্রকাশের মাধ্যম, ততটাই গোপন করার। কবিতা তো আরো গূঢ়তর ভাষা। এখানে কেউ লুকিয়ে ফেলতে চাইলে সাধ্য কি তাকে খুঁজে পাবার ? এক ধরনের থিয়োরাইজেশনও উৎপল করেছেন। যথা— সাহিত্য ধাক্কায় ধাক্কায় এগিয়ে চলে (কোয়ান্টাম তত্ত্ব), তার সময় ঐতিহাসিক সময় নয়, তার স্পেস ভৌগোলিক স্পেস নয়। সাহিত্য আ-মর‍্যাল, অসামাজিক (সামাজিক উত্থান-পতনের সাথে তার কোনো যোগ নেই) এবং সৌন্দর্যহীন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আসলে 'আগলি', 'পিশাচসিদ্ধ', 'নোংরামিতে ভরা'। 'আমি যদি নিজের ভালো চাই, তবে অবশ্যই সাহিত্য থেকে দূরে থাকব…'। ধূসর আতাগাছ-২ থেকে নেয়া। সাহিত্য থেকে দূরে উৎপল। ভাবতে পারেন কেউ ? তাহলে কি তিনি নিজের ভালো চান না ? এ-ও কি ভাবতে পারেন ? আর ঐ 'আগলি', 'পিশাচসিদ্ধ', 'আ-মর‍্যাল' ইত্যাদি ? এগুলিও কি আত্মগোপন বা আত্মপ্রবঞ্চনা ?

তাহলে ফেরা যাক মানুষের পাড়ায়।

দেখুন বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে কী বলেন উৎপল—

'জলে ভেসে গেছে দেশ'
কার দেশ ? কোথাকার জল ? কোথায় চলেছে ?

এবং—

'গ্রাম প্লাবনসীমার মুখোমুখি
উলঙ্গের অর্থনীতি, অন্ধের ভূগোল আর বধিরের ইতিহাস
কে কাকে আশ্রয় দেবে ?
আজ রাতে
কাটা হবে এই বাঁধ ?'

দেখুন, মধ্যশ্রেণী, নিজেদের সম্পর্কে কী ধারণা তাঁর—

'আমাদের পদবী ? শালা/হারামী ছাড়া আর কি হতে পারে ? এক কুম্ভমেলা থেকে আর এক কুম্ভমেলায় হয়রানি। রাইটার্সের কুম্ভমেলা থেকে কর্পোরেশনের, সেখান থেকে আয়কর, সেখান থেকে…'

'দেখাও ভাই, ন্যাংটো মন্ত্রীদের দেখাও, ক্ষ্যাপা আমলাদের দেখাও, ঊর্ধ্বরেতা সম্পাদককে দেখাও, নিম্নরেতা সমালোচককে দেখাও, স্মাগলার উপাচার্যকে দেখাও, জালি বিচারপতিকে দেখাও…'।

ভূমি প্রায় তৈরি— কার দেশ কোথায় চলেছে, গ্রাম প্লাবনসীমার মুখোমুখি, রাইটার্সের কুম্ভমেলা, ন্যাংটো মন্ত্রী, ক্ষ্যাপা আমলা। এরপরে স্বভাবতই চাইবেন উৎপলকে কোনো 'নিপীড়িত সমাজ'-এর পাশে দেখতে। এবং অত্যন্ত তৎপর উৎপল তার গোড়া মেরে রেখেছেন— 'চাষী পরিসংখ্যানজাত' ইত্যাদি।

কেমন যেন বেঁকে যায় উৎপলের ঘাড় এই 'সমাজমানব'-এর কাছে এলেই। না মধ্যবিত্ত (সমাজ), না চাষী (সমাজ), না শ্রমিক (সমাজ)— কোনো সমাজের কাছেই তিনি

সোজা চোখে উপস্থিত হন না। শ্রমিক (সমাজ) সম্পর্কে তেমন কোনো উল্লেখ যদিও পাই না— তবু বোঝা অসম্ভব নয় যে প্রতিক্রিয়া অনুরূপই হবে। উৎপল কি ভাবেন 'চাষী' বা 'শ্রমিক' বা এরকম অন্যকিছু ধারণা দিয়ে সীমায়িত করে দিলে মানুষটা হারিয়ে যায়? এই খণ্ডীকরণ থেকে কোনো জ্ঞানই কি আহরিত হয় মানুষটি সম্পর্কে?

তবে কি মানুষের কাছেও নেই উৎপল?

যদি সত্য সাক্ষ্য দিয়ে থাকে তাঁর কবিতা তাহলে সমাজহীন এক ভিন্ন মানুষের পাশে কখনো কখনো— বস্তুত বারেবারেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। সেই শুরুর দিকে—

'যদি আমাকে সন্ধান করে
বোলো কেল্লার বাজারে
অন্যায় বেদনাহত মুচি ও সন্তানহীন পরিবার
পাদুকা নির্মাণ করে
তাদেরই তৃতীয়জন অথবা চতুর্থজন আমি বা আমার ভাই
ওখানেই আমাদের পাওয়া যাবে।'

এরকমই ছিল তখন। খোপে ফেলে যাদের কথা বলা যায় না ঠিকমতো, সেইরকম কোনো কোনো একক মানুষের কাছে বেশ ধৈর্যশীল বকের মতোই দেখা গেছে তাঁকে। এখনও। যে ছেলেটা পিলখানা বস্তি থেকে ঢাকুরিয়ায় চলে আসে কাগজ কুড়োতে কুড়োতে, তার প্রতি আগ্রহী উৎপল। গড়িয়াহাটের ফুটপাথে যে মানুষটি গড়িয়ে গড়িয়ে সারা শরীর দিয়ে জীবিকা ভিক্ষা করে, তার নামটি জানার জন্য গোয়েন্দার মতো অপেক্ষা করে থাকেন তিনি। তাঁর বইয়ের উৎসর্গপত্রে যে আসে সে হল উৎপলের ছেলেবেলার, অজানা, অদেখা, সকলকে সাবধানকারী নিশাচর মানুষটি, তাঁর ঘুমহীন রাত্রির চৌকিদার। তাঁর মন ছুঁয়ে যায় বেয়ারা বাবুরাম 'পক্‌সিরাজ', তার বিকট রক্ত হিম করা দীর্ণ, বহু-যুদ্ধ দেখা আহত-অশ্বের আর্তনাদ, তার বিশাল ডানা। উন্মাবাবুর অর্শকষ্ট— উৎপলের আশ্বাসদান, ও কিছু নয়। যে বন্ধুর ছেলেটি উচ্ছন্নে গেছে, স্ত্রী মুখরা, সহকর্মীরা শঠ তার ভারাক্রান্ত মাথার জন্য কাঁধ এগিয়ে দেন তিনি। কোথাও কি খুবই ব্যক্তিগত, একধরনের বিবেচনাবোধের শিকার হয়ে পড়েছেন তিনি? এর কি হিসেব দেবেন উৎপল তাঁর পিশাচসিদ্ধির থিয়োরি দিয়ে? ভয়ানক নোটো পাখির কাছে অত্যাচারিত হতে, ভয় পেতে চান উৎপল নিজেকে রোগমুক্ত করার জন্য। কিন্তু তবু 'হারামজাদা বুদ্ধিবৃত্তি, শুয়োরের বাচ্চা বিবেচনাবোধ'-এর হাত থেকে এড়ানো যাবে না, 'নোটো পাখি ছুঁয়েও দেখবে না' এ-সব। বিবেচনাবোধ, দেখুন, কী ভাবে খেয়ে ফেলেছে উৎপলকেও। এই সংখ্যার ১৪ নং কবিতায়— শরীরের বদমায়েসি, গোপনচারিতার কথা জেনেও মন বোকা সেজে থাকে। যেন সাতে-পাঁচে নেই। ভোলা মন, মন রে আমার। উৎপল কি ব্যঙ্গ করছেন মনের এই ভূমিকাকে? কেন? কোনো বিবেচনাবোধ? মরালিটি?

আমার এই খোঁজাও শেষ পর্যন্ত বিবেচনাবোধ-এ এসে ঠেকল। এভাবে কি পাওয়া যাবে উৎপলকে, এইভাবে একটি লেখা থেকে অন্য লেখায়, একটি ডাল থেকে অন্যটিতে, লাফিয়ে লাফিয়ে, আমার মনোমতো শব্দগুলির পিছু পিছু ছুটে বেড়িয়ে? তবু আমার জানতেই ইচ্ছে করে উৎপলের কেন সমুদ্র আসে অথচ নদী নয়, কেন প্রকৃতি শব্দটি আসে অথচ তার থেকে ঝরে পড়ে এমন অ-প্রকৃতি, কেন মানবসমাজ আসে না অথচ মানুষ আসে।

কাল থেকে নিশ্চিতভাবে অন্য কোনো কৌশল নিতে হবে।

আজ কয়েকটি কবিতার জঙ্গল সাফাই করব। অনেক সময় বড় বেশি কথা বলেন কবিরা। অনেক আগাছা থাকে, মূলে একটি, দু'টি কিংবা তিনটি লাইনের আশেপাশে। কবিরা এইসব চালাতে চান কবিতার রক্ত-মাংস বলে। আমি আজ শুধু অস্থিতে পৌঁছতে চাই। আগাছা সরিয়ে ফেললে যদি ওঁর দর্শন পাওয়া সম্ভব হয়।

১। কুসংস্কার সম্পর্কে কবিতা।

কবিতার বিষয়, নিজের আত্মার সঙ্গে মস্করা। উৎপলের আত্মা সবুজ এবং রহস্যময় তো বটেই। নিজের আত্মাকে তিনি খুঁজে ফেরেন মাঠে ঘাটে। আত্মাটিকে অনুরোধ করেন তাঁকে দয়া করে ছেড়ে চলে যেতে।

পরের স্তবকে উৎপলের নিজস্ব ব্যস্ততার ফিরিস্তি। যেমন কৃষিসমবায়ে বক্তৃতা, মৌ-প্রজনন নিয়ে পরীক্ষা, ইত্যাদি। তার অর্থ এখন আত্মা, তুমি বাছা তাড়াতাড়ি কেটে পড়।

এর পরের স্তবকেই একটি আশ্চর্য লাইন— 'সবুজ রহস্যময় আত্মা, তুমি বাছা আমাকে বিরক্ত কর কেন— আমি শীতের লেপের পাশে নেহাতই রৌদ্রের মতো পড়ে আছি'। আর কিছু কি প্রয়োজন থাকে? তবু আবারও তিনি তাঁর আত্মাকে, সন্দেশের বাক্স নিয়ে পাহাড়ের খাদের কিনারে ডেকে নিতে চান। ফুসলানো আর কি! ফুসলিয়ে তিনি জেনে নিতে চান উৎপলের মৃত্যুর পরে তাঁর আত্মা কী কী করে থাকে— অর্থাৎ করবে, আগামী মৃত্যুর পরে।

তারপরে, খুব প্রত্যাশিত ছিল না, দু'টি মোক্ষম পঙক্তি—'তুমি কি শ্মশানে তদ্বির করো শাপমোচনের?' উৎপলের ধারণা, তাঁর আত্মা এতই পাপী হবে যে কিছু উৎকোচের ব্যবস্থা বা ধরাধরি না করলে তার মুক্তির কোনো উপায় নেই, এবং শ্মশানই তো প্রথম দুয়ার। দ্বিতীয় পঙক্তিটি সরাসরি— 'আমি পরীক্ষামূলকভাবে তোমাকে বিদায় দিতে চাই'।

কবিতাটির এই হচ্ছে আমার পাঠ। বস্তুত আমরা উৎপলের আত্মাকে সবুজ, রহস্যময় ও নিতান্তই পাপী বলে জানলাম, এর কবল থেকে, অন্তত সাময়িক মুক্তিও, তিনি কামনা করেন এবং 'আমি শীতের লেপের পাশে নেহাতই রৌদ্রের মতো পড়ে আছি।' এই একটি বাক্যই আমাকে আঘাত করে ফেরে। আমার অভিজ্ঞতা বলে কবিতার

এমন কেন্দ্রীয় লাইনগুলি সরাসরি আক্রমণ করে পাঠককে। তাকে আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না, সম্ভবও হয় না।

২। যীশুর বাড়ির হাঁস।

পয়ারে লেখা এই কবিতাটি কাহিনীর গড়নে সাজানো (উৎপলের কথকতা তুলনা-রহিত)। আমার মনে হয় না কোনো তুলে ফেলার মতো আগাছা জন্মেছে এটিতে। উৎপলের মতোই যীশুর বাড়ির হাঁসেরা একই অনাদরের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিল—

মুস্তফী দিঘীর জলে সাঁতার কেটে, ঝরে পড়া কালোজাম আহার করে এবং পায়ের বেগুনি ছাপ ফেলে ফেলে সর্বত্র। কিন্তু অন্যরা একটু বিরক্ত হয়েছে তাদের এই অবলীলাক্রমে আসা যাওয়ায়। তাদের ঘটিবাটি চুরি যায়। হতেই পারে একটু সন্দেহ। বলেছে তারা— অন্য জলায়, খালে বিলে এবং অন্য আঘাটায় যেতে।

ঐ 'ঘটিবাটি চুরি যায় এবং 'অন্য আঘাটায়' সমস্ত কবিতাটিকে পূর্ণ রসসিক্ত করে। বোঝা শক্ত উৎপলকে, তবু মনে হয় একটু আহত বোধ করছেন তিনি সাধারণের এই অবহেলায়, এই অনাদরে। যদিও গল্পটি তিনি শেষ করেন একটি নৈর্ব্যক্তিক বিবৃতি দিয়ে— 'আমি বুঝিনি তাদের ধর্ম'। সমুদ্রের দিকে চেয়ে হাঁসগুলি পেয়েছিল টের'। কবিতাটির বাইরে যেতে চাইনি আমি। শুধু এটুকুই উল্লেখ করতে চাই যে কেবলমাত্র ছেলেবেলাতেই নয়, পূর্ণ ও পরিণত বয়সের রচনাতেও এই ধরনের অভিমান হঠাৎ বুদ্বুদের মতো এসে পড়ে জলতলে।

৩। ষষ্ঠীতলা ২।

কবিতাটির কেন্দ্রে আছে এই লাইনটি :

'তান্ত খোলস চলে এঁকেবেঁকে সাপের সন্ধানে।'

প্রায় সমস্ত কবিতাটি এই তান্ত খোলসের আর্তনাদ। আমি বাবুটিকে চেনো না কি, আমি গয়ারাম, ভাগ্যান্বেষী, দাঁতাল মহিমা, মায়ের সুনামে স্কুল, বাপ-নিকেতন— যে আমি বস্তুত সারহীন, 'ভাঙ্গা নাটমন্দিরের মাটি', 'প্রতিমা ও প্রতিমার জলজ কলস'। আর একদিকে, এই প্রজন্মের কিশোরীরা যেন সরলবর্গীয় গাছ, কাঁটাতারের মতো হাসে তারা, আমেরিকার দুধ, চীনের কলম, নেপালের ছাতা প্রতিপালিত— আহা আন্তর্জাতিকতা— এই সমস্ত 'নড়েভোলা' 'ভূগোল-শিশু— দশে দশ। এও খোলস।

কিন্তু খোলসের এই সর্পসন্ধান কেন ?

'চলে এঁকেবেঁকে— করুণ প্রচেষ্টা, দৃশ্যতই। এ আমি বুঝি, খুব স্বাভাবিক লাগে আমার কাছে এই প্রাণপাত।

কিন্তু উৎপল এই জ্যাকেটটি নিয়ে কাহার শরীরে পরাতে চললেন ? এ-কি তাঁর আত্মা-বিদায় পালার শেষ অঙ্ক ? একটা দায়বোধ উঁকি দিচ্ছে যেন কোথাও।

৪। এই সংখ্যার ৬ নং কবিতা।

আমি নাম দিয়েছি 'ফুলডুঙরি পাহাড়' অথবা চেপারামের ঘর' (পাণ্ডুলিপিতে উৎপল যে নামটি লিখেও কেটে দিয়েছেন সেটি হল 'হাঁপানি'— যেন আসল কথা এই হাঁপানি)। কথা না বাড়িয়ে আমি যেভাবে এই কবিতাটি পড়েছি তা জানাই—

শ্বাসকষ্ট উঠলেই বুঝতে পারি ফুলডুঙরি পাহাড়
আর বেশি দূরে নয়—
যে জলস্রোত লাফিয়ে পার হয়েছিলাম তাকে
ঘুরিয়ে চাষজমির দিকে নিয়ে যাবার কথা ছিল—
এমন হাঁপাচ্ছি কেন ?
হাসপাতালের বিছানা শুকনো ডালপালায়,
ছেঁড়া কাগজে আর পরিত্যক্ত সাপের খোলসে
ভরে ওঠে— চেপারামের ঘরটা
এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। আরেকটু পা চালিয়ে
উঠে গেলেই হয়।

আশ্চর্য কবিতাটি! যে উৎপল তাঁর সবুজ আত্মাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন সেই তিনিই ফুলডুঙরির শীর্ষে প্রায় পৌঁছে গেছেন। শ্রীচেপারামের ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন, আর একটু গেলেই হয়।

লক্ষ করুন গতিপথটি, আত্মার হাত থেকে পলায়ন— সাধারণের অবহেলায় অভিমান— নিজেকে খোলসমাত্রবিধায় কোনো সারবস্তুর সন্ধান— চেপারামের ঘরের কাছাকাছি। মন চলো নিজ নিকেতনে। এমনই তো হবার কথা। তবু কেন ধর্মকে যুধিষ্ঠিরের কাছে বারবার প্রশ্ন করে জেনে নিতে হয়!

'...যাবেন শ্মশানঘাট দিয়ে,
সেথা জেগে উঠেছে বাতাস তার পূর্বাপর নিয়ে।'

মন্তব্য করতে গিয়ে উৎপলের এই অসামান্য লাইনটি এসে গেল, হয়ত সংগতি ছাড়াই। পঙক্তিটি ছেঁটে নিয়ে আমি শুধু পড়ি— 'জেগে উঠেছে বাতাস তার পূর্বাপর নিয়ে।' আর কিছুই লাগে না আমার।

কতটুকুই বা বোঝা গেল উৎপল বসুকে এই এক্সারসাইজ কষে, এই ক'টি কবিতার আগাছা সরিয়ে? নিজের আত্মার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে করতে, কোনো সার-বস্তুর সন্ধান করতে করতে বস্তুত তিনি শ্রীমৎ চেপারামের ঘরের দিকে চলেছেন, প্রায় পৌঁছেই গেছেন। অতএব 'মৃত্যুচেতনা' ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে যখন প্রায় বেঁধে ফেলা হয়েছে তাঁকে তখনই কথাপ্রেমী (এবং অভিমানীও বটে) উৎপল লিখে ফেলেন—

'তেমন করে আসতে বলেছিলে ?

যা-কিছু বলো বিকেলবেলায় স্বীকার যাই, মেঘের আলো, জলের যাঁতা, বৃষ্টিভেজা রৌদ্রভেজা, স্বচ্ছ থালে শুকোতে দেওয়া রক্তটুকু, জানলা-সিলে, আজও সরল, আলোতরল, না শুকোলে কে জানবে কোন্ বীজাণু, কোন্ চুম্বন, কোন্ কবিতা।'

জানলা-সিলে !
এমন শব্দ যাঁর আসে পরিণত স্তরে, সে কবির জীবন কে বিনাশে ?

এবারে একটু সন্ধিতে আসা যাক। উৎপল, আপনি আড়ালে থেকেই, আমার সাথে অন্ত্যাক্ষরীর মতো একটি খেলাতে যোগ দিন, অর্থাৎ আমি সেই মতো প্রস্তাব রাখছি। প্রকৃতির সাথে বিজ্ঞানী অথবা পরিপার্শ্বের সাথে শিশু যেভাবে খেলে ; আমাদের খেলাটি কিছুটা সেইমতো হবে। সম্প্রতি ডানিয়েল ওশারসন এই পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সকলের। বিজ্ঞানী অথবা শিশু এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী এবং শেখার বিষয় প্রকৃতি অথবা পরিপার্শ্ব। বিজ্ঞানী সামান্যই জানেন তাঁর প্রতিপক্ষ প্রকৃতি কী তথ্য উন্মোচন করবে তাঁর কাছে, অর্থাৎ কী কথা বলবে। তিনি একটি সম্ভাব্য সূত্র (ধারণা) উপস্থাপিত করবেন। সেই সম্ভাব্য সূত্রমতো তাঁর প্রতিপক্ষ কিছু কিছু তথ্য এগিয়ে দেয় এবং কিছু অন্য তথ্যও। এগুলির ভিত্তিতে সূত্রটি বদলে ফেলেন বিজ্ঞানী, নতুন সূত্র দেন। প্রকৃতি আবার সাড়া দেয় তথ্য দিয়ে। খেলা এভাবেই চলতে থাকে।
আমাদের খেলাটির নিয়মাবলি সূত্রায়িত করি এখন—

প্রথম চাল আমার। আমি একটি বা দু' তিনটি শব্দ এগিয়ে দেব। তারপরে আপনি পরপর কিছু শব্দ, শব্দবন্ধ বা বাক্য এগিয়ে দেবেন। এগুলি, আমি আশা করব, কোনোভাবে আমার শব্দগুলির সাথে সংগতিময় (একান্তই আপনার ধারণামতো)। তারপরে আমি। আমার নির্বাচনে আমি সংগতি রক্ষা করতেও পারি, আবার হঠাৎ একেবারে নতুন শব্দ চেলে দিতে পারি। এবং তারপরে আপনি আবার। এভাবেই চলবে। কীভাবে শেষ হবে এ খেলা অথবা জয়-পরাজয় কীভাবে স্থির হবে অথবা আদৌ থাকবে কিনা, খেলতে খেলতেই বোঝা যাবে হয়ত। শুরু হোক খেলা তাহলে।
[দর্শকবৃন্দ, লক্ষ করবেন আমার ব্যবহৃত শব্দগুলি নিতান্তই মামুলি ধরনের, এমনকি স্থূলই বলা চলে অনেকগুলিকে। দেখুন উৎপল কীভাবে খেলেন সেগুলি।]

আমি — ভালবাসা।
উৎপল— আমাদের দু-চার বছর আরো অতিরিক্ত ভালবাসা হতে পারত।
আমি — স্বপ্নে বহুক্ষণ।

উৎপল— স্বপ্নে তুমি কতবার তিরস্কার করেছিলে— ভাবি সারাদিন— স্বপ্ন ফুরায় আর সময় ফুরায় আর সামান্যই থাকে।

— সমস্তরাত ডুবো নদীর পাড়ে, আমি তোমার স্বপ্নে পাওয়া আঙ্গুল, স্পর্শ করি জলের অধিকারে।

আমি — চিরজীবন

উৎপল— তোমাকে কিছুক্ষণ ভালো লেগেছিল। তারপর নিয়নে বিদ্যুৎ সহসা জানাল ঐ টুথপেস্ট আরো ভালো।

— প্রিয় তোমার শাড়ির থেকে চোরকাঁটা বেছে দিতে আমি অপারগ— অন্তত এবার। তোমার বাবার কাছে ফিরে যাওয়া ভালো।

আমি — জীবনবীমা

উৎপল— বীমার দালালি করে ভালবাসাবাসি হল আমার ও মাধবীর।

আমি — সন্দেহ

উৎপল— আমার হোটেল থেকে দেখা গেল— যতখানি তোমাকে দেখায়— কিছু কি গোপন রাখো? কোন প্রেমবৈষম্যের হাসি?

আমি — বিষাদ

উৎপল— তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি হারিয়েছে বাদাম পাহাড়ে।

আমি — অবসাদ

উৎপল— ভালবাসা থেকে দূরে রেখেছ কি মদ?

— ভালবাসা সে কি ভুল? লিখে রাখি দেহতাপ, প্রসারমালিনী এই ফুলবনে শুয়েছিল।

আমি — শরীর।

উৎপল— জানু তুমি! তুমিই জানালা। অনুসন্ধিৎসায় তুমি খুলে যাও— পুরুষের প্রেমের খেয়ালে।

আমি — যৌনতা।

উৎপল— নিজেরই বোনের প্রতি যৌনতা।

— যুবার পেশীর তলে সদ্যজন্ম ক্ষুধার্ত ইঁদুর।

— আমার স্ত্রীলোকেরা কোথায়।

— এখন বৎসর ঘুরে যৌনতার কাল এসে গেল। পেতে চাই অক্লান্ত শয়ন প্রতিটি ফুলের সাথে।

আমি — আগুলি।

উৎপল— বৃষ-মহিষের মতো সমকামী নারীদের একাধিক রবারের উরু নিয়ে খেলা।

আমি — উরুখেলা।

উৎপল— অপরাহ্ণেই আমি স্তনসমেত বেলাকে পেতে চাই বাথরুমের ভিতরে।

— স্ত্রীলোকেরাও বেশ রসালো হয়ে উঠেছে এবং পুরুষেরা শিথিল হয়ে পড়ছে ক্রমশ।

আমি — হিতোপদেশ।

উৎপল— স্ত্রীলোকের জন্য তায় লোভ শর্তহীন।

— প্রিয়তমা দেখছি তোমার কালো স্তন ভরে যায় ধর্মীয় দ্রুত লিখন অক্ষরে।

আমি — সামাজিক দায়বদ্ধতা, অনুশাসন।

উৎপল— অতি অলৌকিক গম্ভীর আকাশী ঘণ্টা, তুমি কেন ডাকো।

— মানুষকে ভালবেসে, মানুষকে ঘৃণা করে অল্পই লাভ হল— সামান্যই ক্ষতি হল তার

আমি — প্রতিশ্রুতি।

উৎপল— আমার প্রতিশ্রুতি ছিল নেহাতই নাগরিক।

— আমি প্রতিশ্রুত নই লেখার জন্য।

আমি — স্বপ্ন।

উৎপল— আমার স্বপ্ন আমাকে ঘৃণা শিখিয়েছে।

আমি — ঘৃণা রাষ্ট্রকে, ঘৃণা ক্ষমতাকে।

উৎপল— ভোরবেলা কলতলায় এঁটো বাসনের স্তূপের উপর কেন হিম দাঁড়িয়ে থাকে গোয়েন্দা শুকতারা, সূর্য ওঠার আগে, ঠিকে আসার আগে।

— আমি ভালবাসি কচি কচি মন্ত্রীদের গালভরা হাসি।

— শস্যের সবুজ— তার হাহাকার— তার বীভৎসতা— তার রক্ত-ঝরে পড়া।

আমি — নিভৃত দায়

উৎপল— বন্ধু তোমার আজ যা বলার আছে আমাকেই বলো।

— ক্ষেত জাঙ্গালের কাছে ফিরে যেতে ভালো লাগে। নিরক্ষর বেশ্যাদের কাছে যেতে ঠিক ততখানি ভালো লাগে।

আমি — ক্রমাগত দায়ভার

উৎপল— এদিকের বিবাহ ফুরোলে, অন্য কোন বিবাহের উৎসবের জোয়ারভাঁটার দিকে চলে যাব।

আমি — পরিপার্শ্ব

উৎপল— এত জঞ্জাল সরাবে কে ? আমি কি সময় করে উঠতে পারবো ?

আমি — স্বাধীনতা, মুক্তি

উৎপল— ফাঁসির মঞ্চে বসে কাটে নখ ক্ষুদিরাম— স্বাধীনতা এখনো উন্মন করে আস্তাকুঁড়ে পচে-ওঠা সার শুধু জমেছে শহরে।

— কতখানি মুক্তি চাই ? তুমি বলেছিলে দু' হাত চার হাত। ভিখিরির সহচর পারিয়া কুকুর ঠিক যতখানি মুক্তি পায়।

আমি — বিদ্রোহ, আন্দোলন, হত্যা

উৎপল— স্রোত বিপদসীমার উপরে বইছে
— আমাদের জেলখানা ভরে যাবে পলাতক অসংখ্য যুবকে।
— ফেলে দেওয়া মৃতদেহ, গাছের পাতায় ছিটানো রক্তের দাগ লেগে আছে—
আমি — রাজনীতি
উৎপল— আমি লিখি আলাদা যুদ্ধের গল্প।
— এইভাবে শান্তি টানে যুদ্ধকেও।
আমি — শ্রেণীসংগ্রাম।
উৎপল— ঐ যা বলেছি তার বেশি কিছু বলবার নেই। ...তোমাদের হাতে তো রয়েছে গ্রেপ্তার পরোয়ানা, কোমরে পিস্তল আর উকো শিক যে-কোন দরজা খোলে, আমি জন্মমূক, কাকে চাও অবশ্যই জানি, ঐ বাদুড়ের মতো, ঐ কামঠের মতো আমি গতিময় অথচ নিশ্চল।
আমি — ট্র্যাডিশন
উৎপল— মধুসূদনের কবরের উপর আমি এক বৃষ্টির দিনে ছাতা খুলে বসেছিলাম।
— সাপের খোলস চলে এঁকেবেঁকে সাপের সন্ধানে।
— কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিম, ঈশ্বর, শিবনাথ, ভগিনি, জোড়াসাঁকো— রয়েছেন এঁরা সব প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃকুল মাতৃকুল পরম্পরাপ্রিয়।
আমি — লৌকিকতা
উৎপল— নদী যতটা জটিল তার চেয়ে লৌকিকতা গূঢ়। ...নিমন্ত্রণলিপি শুধু— তার চেয়ে কে আর জাগ্রত।
আমি — প্রতিষ্ঠা, অমরতা
উৎপল— আমাদের মাথার চতুর্দিকে জ্যোতিষ্মান জড় দেবতার থালা দেখা দিতে পারে।
— আশা তা কি মৃত্যুর মতন বৃষ্টিহীন নয়?
আমি — আশা
উৎপল— আজো নই সুর, নই গান, নই উত্থানপতনের কোন ভ্রষ্ট রাজা, গীর্জার আঁধার— তবু আঙ্গুল কেন উন্মাদক? কেন আঙ্গুলে অক্ষর? কেন আমার ক্ষমতা নেই বিশাল ধ্বংস হয়ে জন্মিয়ে ওঠার।
— গেয়েছি সামান্য গান।
— ওগো প্রাণ, তুষ্ট হও।
আমি — মৃত্যু
উৎপল— লেখার খাতা অসম্ভব, অজ্ঞান লেখায় ভরে গেছে।
— বিদ্যুৎহীন এ লেখাসকল পাবে কশাঘাত।
— ফুলডুঙরি, চেপারামের ঘর।
— আমার প্রেতিনী কামড়ে ধরেছে দাঁতে এ মরজগত।

নাঃ। এই খেলা আর খেলতে চাইছেন না উৎপল, হয়ত ধরা পড়ে যাবার ভয়। আমারও মনে হচ্ছে প্ল্যানচেটে তাঁকে টেনে নামিয়েছি টেবিলে, কুরুচিকর লাগছে নিজের কাছেই। এ খেলার হাত থেকে মুক্তি চাই আমিও।
উৎপল তাঁর ভুলের জগতের দিকে ইঙ্গিত করে দ্রুত সরে পড়লেন।

হ্যাঁ, ভুলের মধ্যেই যেন অবস্থিতি তাঁর, হয়ত স্বস্তিও। এক ভুল থেকে ভিন্নতর ভুল-এ। এর মধ্যে কোনো রোমান্টিকতা নেই। অত্যন্ত বাস্তব এই ভুল এবং ভুল-বদল। পুরী সিরিজের কবিতাটি, স্মৃতি-২ ধরা যাক। 'আমার সৌভাগ্য ছিল ভুল বিদ্যাশেখা— ভুল আবিষ্কার— ভুল প্রজনন— ভুল গরিমা ও ভুল তুলাদণ্ড— ভুল ধূপাধার— ভুল পুষ্করিণী— ভুল দেবদারু— ততোধিক ভুল স্মৃতি, মিথ্যাবাদ, খেলাধূলা, বলের লাফানো আর মেঘের ভেতর থেকে আবির্ভূত জীবনের প্রথম এরোপ্লেন' এবং তারপরে আবার সমস্তটাই নাকচ— 'তাও সত্য নয়।'
সেই পুরনো ধন্ধে আবার। উৎপল কি নিজেকে খুলে ধরলেন না দু'টি নৌতির পর্দা তৈরি করে আড়ালে গেলেন আরো একটু।
কারো যাত্রার শুরু যদি কয়েকটি নেতিবাচক বাক্য-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে হয় এবং তিনি যদি একের পরে এক যুক্তিসঙ্গত নৌতির মধ্য দিয়ে চলতে থাকেন তাহলে কি উৎপলের চলনপথের কোনো তুলনা পাওয়া যাবে? স্মৃতির ভুলগুলি এবং পিছুটান (ভুল?) ছাড়া আর কিছু তিনি নিয়ে আসেননি— এমনই মনে হয় উৎপলের। শহরে, তাঁর মতে, তিনি শিখেছেন যথার্থ গান। কিন্তু এও কতখানি নির্ভুল? প্রায় সবক্ষেত্রেই তিনি কোনো ধারণা এবং বিরুদ্ধধারণার মধ্যে অনায়াস চলাচল করেছেন— স্বৈরতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রে, অরাজকতায় অবলীলাক্রমে। ধরে নিচ্ছি শহরই তাঁকে যথার্থ গান বিবেচনাবোধ, বিচারবুদ্ধি, প্রতিটি সুরের শোকার্ত ঘর শিখিয়েছে, এবং যামিনীচারিতাও। কিন্তু এই বিবেচনাবোধের হাত থেকে তিনি যে পরিত্রাণ চাইছেন এও স্পষ্ট। তাহলে কি এই বিবেচনাবোধও তাঁর অন্যতর ভুল? বিবেচনাবোধ তাঁকে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু-ব্যাপকতা থেকে সরে আসতে বলেছে, কারো মুখোমুখি বসে থাকতে শিখিয়েছে কিন্তু আবার, তৎক্ষণাৎ, এই সরে আসা ভুল, ভুল এই বসে থাকা। তার ফলেই কি নিজের অবচেতনকে ভয় পেতে শুরু করেছেন তিনি? 'আমার অবচেতন মন যা যা চেয়েছিল তার প্রতিটি রহস্য দেখছি এই গ্রীষ্মশেষের বৃষ্টি কোনও এক কৌশলে জেনে ফেলেছে, সে এর চেয়ে বেশি কিছু জানে কিনা ভাবতেও ভয় হয়।' তবে এই ভুলগুলি বা anti-theorem-গুলির মধ্য দিয়ে যাওয়া ছাড়া আমি অন্য কোনো পথও দেখি না।
ক্রমাগত ভুল কি অভিমানী করে তোলে? 'একদিন যখন সময় হবে, বোসো এই কাব্যের পাশে একে ভাঙা টেবিলের মতো তুমি কাছে টেনে নাও।' অথবা 'আমার লেখা শেষ পর্যন্ত সেইসব ঠগবাজ পড়বে যাঁরা হেঁসেলে মদের বোতল লুকিয়ে রাখে।'
কিন্তু ঠিক কি তাই? তবে 'যোগসূত্র'-এর এই সংখ্যায়ন কেন? কেন তাঁর সাথে আমার

এই অর্বাচীন খেলার আয়োজন? এটা বোঝা শক্ত নয় যে আমার এবং উৎপল বসুর মধ্য দিয়ে অসংখ্য সমান্তরাল রেখা প্রবাহিত। কিছুতেই আমার কোনো রেখা ওঁর কোনো রেখাকে স্পর্শ করে না, বরং কল্পেও করে না। তার অর্থ আমাদের পারস্পরিক জ্যামিতি অ-ইউক্লিডীয়। ইউক্লিডীয় হলে বিশুদ্ধ শরীরযাপনের রেখা দুটি ছাড়া অন্য সমস্ত রেখাই কোনো না কোনো স্থানে পরস্পরকে স্পর্শ করত। আমাদের কথোপকথনের খেলাটিতে উপরোক্ত সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হয়। খেলাটিও তাই জন্মে উঠেছিল অসম্ভব রকমের। কিন্তু একটু হিংস্র হয়ে উঠছিল শেষ দিকে। আমি তো প্রাণপাত করেছি ওঁকে ধরে ফেলবার জন্য। ভালবেসেছি এই যুদ্ধ। এতে কি উৎপলের অভিমানও ভুল বলে প্রমাণিত হয় না?

'প্রতিধর্ম' বলে দেয়, আমি চাই অসম্পূর্ণ পাঠ।' মানি আমি। এ খেলাও আমার একটি অসম্পূর্ণ উৎপল-পাঠ। ধরা তিনি দেবেন না। কিছুতেই। আমি শুরুতেই এমন ভেবে রেখেছিলুম।

দেখুন, দেখুন—

ঐ যে চলে যাচ্ছেন উৎপল, কাপড়ের জুতো— ঢোলা পাজামা— ফতুয়া এখনও মাথাভর্তি চুল— কাঁচাপাকা—দেখুন ট্রাম লাইন পেরিয়ে বাজারের দিকে, ঐ লুকিয়ে পড়লেন, আবার মাথা তুলেছেন।

কিন্তু না:

দূর দূর, কোথায় উৎপল, ওতো গোপাল ঐ তো সারদা বাজার করে ফিরছে জনার্দন-বাবু কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

আশ্চর্য! আবার ভুল হল। □